THE OTTOMAN EMPIRE

উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাস

THE OTTOMAN EMPIRE

উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাস

ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি

অনুবাদ
কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
মাহদি হাসান

সম্পাদনা
আহসান ইলিয়াস
সালমান মোহাম্মদ

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাস

ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৯

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ পাবলিকেশন
অস্থায়ী কার্যালয় : বিক্রমপুর কটেজ, ৩০৯/৬/এ,
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ি, মাদরাসা রোড, ঢাকা-১২০৪
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৯১১১-৩৩২৫১

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার পরিবেশক
মাকতাবাতুন নুর : ০১৮৫৭-১৮৯১৪৪
মাকতাবাতুল হিজাম : ০১৯২৮-৫২০২৫৩
মাকতাবাতুল ইসলাম : ০১৯১২-৩৯৫৩৫১

যাত্রাবাড়ি কিতাবমার্কেট পরিবেশক
মাকতাবাতুল মোল্লার বই ও অন্যান্য

অনলাইন পরিবেশক
❒ রকমারি.কম, ❒ ওয়েল বিড ❒ ওয়াফি লাইফ, ❒ খিদমাহ শপ.কম, ❒ বই বাজার, ❒ শব্দালয়

মূল্য : BD ৳ ৮০০, US $ 25, UK £ 15

THE OTTOMAN EMPIRE

Writer : Dr. Ali Muhammad Sallabi
Translated by : Kazi Abul Kalam Shiddique & Mahdi Hasan
Editor : Ahsn Elias & Salman Mohammd

Published by
Muhammad Publication
309/6/A South Jatrabari, Madrasa Rd, Dhaka-1204
+88 01315-036403, 019111-33 251
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-34-7342-4

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অর্পণ

লেখকের নেকহায়াত ও ইমানি জিন্দেগি কামনায়...

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

হিজরি সপ্তম শতাব্দী। মঙ্গোলীয়দের আক্রমণে লণ্ডভণ্ড আব্বাসীয় খিলাফত। ইসলামি ইতিহাসের এক চরম দুর্যোগপূর্ণ সময়। ঠিক ওই সময়ে মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে হেসে ওঠে এক নবারুণ সূর্য। দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে সেই সূর্যের দীপ্তি। ইসলামি সাম্রাজ্যের মেঘলা আকাশকে স্বচ্ছ এবং প্রখর রোদের উজ্জ্বল আকাশে পরিণত করা সেই সূর্যের নাম *উসমানি সালতানাত*। যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী দোর্দণ্ড প্রতাপে এবং ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে শাসন করেছে মুসলিম বিশ্ব। একের পর এক রাজ্য বিজয় করে ইসলামকে করেছেন সমুন্নত এবং সম্প্রসারিত। দীর্ঘকাল যাদের কথা চর্চা হয়ে আসছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

কীভাবে উত্থান হলো এই মহা শক্তিশালী সালতানাতের? কী তাদের পরিচয়? কোথা থেকে তাদের আগমন? কীভাবে-ই বা ধ্বংস হয়ে গেল এমন শক্তিশালী *উসমানি সাম্রাজ্য* বা *অটোমান এম্পায়ার*? কীভাবে শেষ হয়ে গেল হাজার বছরের চলমান খিলাফতব্যবস্থা? প্রশ্নগুলো যদি আপনার মস্তিষ্কের দরজায় কড়া নাড়তে থাকে, আর এর উত্তর খুঁজতে আপনি অস্থির, তবে এ বই আপনার জন্য।

উসমানি সাম্রাজ্যের সঠিক ইতিহাস জানার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ বহু পাঠকের হৃদয়ে জমেছিল প্রবল তৃষ্ণা। তাদের তৃষ্ণা নিবারণেই ব্রতী হয়েছেন লিবিয়ার প্রথিতযশা লেখক, বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও গবেষক ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি। ইনসাফের সাথে তুলে ধরেছেন উসমানি সাম্রাজ্যের সঠিক ইতিহাস।

বইটি অনূদিত হয়েছে কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক এবং মাহদি হাসান—দুজনের হাতে। ইসলামি প্রকাশনায় কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক এক গৌরবের নাম। অনুবাদ ও মৌলিক রচনায় যিনি পাঠকের হৃদয়ে হৃদয়ে।

মাহদি হাসান। তরুণ অনুবাদক। মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত *মুহাম্মদ আল-ফাতিহ* অনুবাদ করে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছেন। আশা করি এই অনুবাদের মাধ্যমে পূর্বের চেয়ে পাঠকের ভালোবাসায় অধিক সিক্ত হবেন।

বইটি সম্পাদিত হয়েছে আহসান ইলিয়াস ও সালমান মোহাম্মদ—দুজনের হাতে। ভাষা-সম্পাদনায় উভয়ে পরিচিত ও প্রাজ্ঞ। আহসান ইলিয়াস; একজন লেখক, অনুবাদক ও অভিজ্ঞ সম্পাদক। শতাধিক বই তাঁর দক্ষ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

সালমান মোহাম্মদ। লেখক, অনুবাদক ও গ্রন্থসম্পাদক। বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রকাশনীর বই সম্পাদনা করে তিনি ইতোমধ্যে দক্ষ সম্পাদক হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। *মুহাম্মদ পাবলিকেশন*-এর একাধিক বই-ও তাঁর হাতে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

দুজন দক্ষ অনুবাদক ও সম্পাদকের হাতে ইতিহাসের এমন অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ *মুহাম্মদ পাবলিকেশন* থেকে প্রকাশিত হওয়া সত্যিই গর্বের বিষয়।

আমরাও চেষ্টা করেছি বইটি যথাসাধ্য সাবলীল ও নির্ভুল করতে। বিশেষ করে বিভিন্ন স্থান, স্থাপনা ও ব্যক্তির সঠিক নাম উল্লেখ করতে; কিন্তু মানুষ ভুল, অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়। অজ্ঞাতসারে বা অসতর্কতাবশত ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভাষা প্রয়োগে জটিলতা বা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। পাঠক এগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবহিত করবেন বলে আশা রাখি।

আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। বইটি সত্যান্বেষণকারীদের নিকট গ্রহণযোগ্য করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
১৮ শাবান, ১৪৪০ হিজরি

অনুবাদকের কথা

প্রিয় পাঠক, আপনি নিজেকে প্রস্তুত করুন একটি সফরের লক্ষ্যে। আমরা দেখে আসব গাজি আর্তুগ্রুলের নেতৃত্বাধীন সেই ক্ষুদ্র জনপদ, যারা মঙ্গোল রক্তপিপাসুদের ভয়ে নিজ ভিটে-মাটি ছেড়ে খুঁজে ফিরছিল নিরাপদ আশ্রয়। অতঃপর সেই ছোট্ট কাফেলা হতেই সূচনা হয় ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়, যার নাম 'উসমানি সাম্রাজ্য'। সে সাম্রাজ্যের স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন গাজি আর্তুগ্রুল। আর সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নকারী হলেন সুলতান প্রথম উসমান, যাঁর নামেই উদীয়মান এ সাম্রাজ্যের নাম রাখা হয় 'উসমানি সাম্রাজ্য'।

ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে বিচরণ করে অতীত থেকে আমাদের অনুপ্রেরণা এবং শিক্ষা নেওয়া উচিত। অনুপ্রেরণা নেওয়া উচিত—গাজি আর্তুগ্রুল, প্রথম উসমান, উরখান, বায়েজিদ, মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ, সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের মতো মহান বীরদের জীবনী থেকে; শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত আর—দ্বিতীয় মাহমুদ, আবদুল মাজিদ প্রমুখ সুলতানদের দুর্বলতা থেকে।

আমরা দেখব, আমাদের সোনালি ইতিহাসের বীর মুজাহিদদের, তারা কীভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করে উড্ডীন করেছিলেন ইসলামের বিজয়পতাকা। দেখব গাজি আর্তুগ্রুল ভিটে-মাটিহীন এক কাফেলাকে নিয়ে কীভাবে গড়েছিলেন এই বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত। কীভাবে প্রথম উসমান বাস্তবায়ন করেছিলেন পিতার দেখিয়ে যাওয়া রূপরেখা। দেখব মুহাম্মদ আল-ফাতিহের বিখ্যাত সেই কনস্টান্টিনোপল বিজয়। পাহাড়ের ঢালু উপত্যকা দিয়ে রাজহাঁসের মতো বয়ে চলা ইসলামি নৌবহরের বিস্ময়কর দৃশ্য। দেখব খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদের দৃঢ়তা। শত ষড়যন্ত্রের মুখেও যিনি ছিলেন ইস্পাত কঠিন। ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েও যিনি আল্লাহর শরিয়াহ বাস্তবায়নে এক চুলও ছাড় দেননি।

আমরা দেখব, মুসলিম জাতির প্রতি ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং বিধর্মীদের ধারাবাহিক হিংসা-বিদ্বেষ ও ভয়ানক ষড়যন্ত্রের চিত্র। সতর্ক হব তাদের নিত্য নতুন কৌশল থেকে। যে কৌশল দিয়ে তারা ভেঙে দিয়েছে আমাদের ঐক্যের মেরুদণ্ড খিলাফত। প্রিয় পাঠক, এমন একটি শিক্ষসফরের জন্যই আপনাদের কাছে নিয়ে এলাম 'উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাস'। এর পাতায় পাতায় বিচরণ করে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন সেই সব চিত্র।

ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি। বর্তমান ইতিহাসবেত্তাগণের মাঝে একটি নির্ভরযোগ্য নাম। যিনি নিরলস পরিশ্রমের মধ্যদিয়ে আমাদের জানিয়ে যাচ্ছেন আমাদের অতীত ইতিহাস। তিনি নিছক ইতিহাস বর্ণনা করে যান না; বরং বর্ণনার সাথে সাথে পাঠককে বাধ্য করেন ভাবতে, শিখতে। তাঁর রচিত অদ্বিতীয় এক গ্রন্থ *'আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ আওয়ামিলুন নুহুদ ওয়া আসবাবুস সুকুত'*, যা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। বহু ভাষায় তা অনূদিতও হয়েছে। বাংলা ভাষায় তা পাঠকের হাতে তুলে দিতে সচেষ্ট হয়েছেন *মুহাম্মদ পাবলিকেশন*-এর কর্ণধার শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান।

গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে দুজনের হাতে। প্রথম অর্ধেকের অনুবাদ করেছি আমি। আর দ্বিতীয় অংশের অনুবাদ করেছেন পাঠকপ্রিয় সুপরিচিত অনুবাদক শ্রদ্ধেয় কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শ্রদ্ধেয় উসতাজ, পিতৃতুল্য আহসান ইলিয়াস সাহেবের, যাঁর কাছে আমার লেখালেখির হাতেখড়ি, তিনি বিভিন্ন সময় আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন পথনির্দেশ করেছেন, আমার সৌভাগ্য যে, এই বইটি তাঁর দক্ষ হাতে সম্পাদিত হয়েছে। সম্পাদনা-সহযোগী হিসেবে যুক্ত ছিলেন শ্রদ্ধেয় ভাই সালমান মোহাম্মদ, আমি তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞ।

প্রিয় পাঠক, দীর্ঘ বইটি অনুবাদ করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি হয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। কোনো ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের অবহিত করার আবেদন রইল। সবশেষে পাঠকের কাছে দোয়ার আবেদন, আল্লাহ যেন সকলের প্রচেষ্টা কবুল করেন। সবাইকে কল্যাণ ও নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে রাখেন এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্য করার তাওফিক দান করেন।

—মাহদি হাসান
২০ অক্টোবর ২০১৯

লেখকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি। তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের কুপ্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে এবং আমাদের মন্দ কর্ম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে সুপথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সুপথে আনতে পারবে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি একমাত্র আল্লাহই আমার প্রভু। তাঁর কোন শরিক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং তোমরা প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [আল-ইমরান, ২০১]

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহযাব, ৭০-৭১]

হামদ ও সালাতের পর...

হে প্রভু, তোমার মহিয়ান সত্তা আর বিশাল সাম্রাজ্যের মর্যাদাতুল্য প্রশংসা, তোমার প্রশংসা যে যাবৎ না তুমি সন্তুষ্ট হও; তোমার প্রশংসা যতক্ষণ-না তুমি রাজি হও।

এটি হচ্ছে *'ইসলামি ইতিহাসের পাতা'* সিরিজের ষষ্ঠ বই, যাতে উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। এতে তুর্কিদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হবে, কখন তারা ইসলামে প্রবেশ করেছে। জানানো হবে ইতিহাসের পাতায় তাদের গৌরবান্বিত কাজের কথা। বিভিন্ন উৎসের সাহায্যে এবং রেফারেন্সের মাধ্যমে জানানো হবে কতক তুর্কি ব্যক্তিত্বের জীবনী, যাঁদেরকে পবিত্র কুরআনুল কারিম সমৃদ্ধ করেছে, যাঁরা ইসলামি সভ্যতা বিনির্মাণে অবদান রেখেছেন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতাদর্শের সাহায্যকারী হয়েছেন। যেমন : সুলতান সেলজুক শাহ, আলপ আরসালান, নিজামুল মুলক এবং মালিকশাহ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। এখানে তাদের জিহাদ, দীনের প্রচারণা এবং ইলম ও ন্যায়ের প্রতি তাদের ভালোবাসার কথা তুলে ধরা হবে। বর্ণনা করা হবে, যে সকল তুর্কিরা উসমানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্য ছিল সেলজুক সালতানাতকে সাহায্য করা। এমনিভাবে বইটিতে প্রথম উসমান, উরখান, প্রথম মুরাদ, মুহাম্মদ চেলপি, দ্বিতীয় মুরাদ এবং মুহাম্মদ আল-ফাতিহ প্রমুখ উসমানি শাসকগণের সম্পর্কে ইনসাফপূর্ণ আলোচনা করা হবে। বর্ণনা করা হবে তাঁদের গুণাবলি এবং তাঁদের অনুসৃত নীতিমালা।

বইটি আরও বলবে, তাঁরা রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পথে আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পন্থার সাথে আর কী কী পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যেমন : বিভিন্ন উপায়-উপকরণ গ্রহণের পদ্ধতি, মনোবৃত্তি পরিবর্তনের পদ্ধতি, প্রতিরক্ষাসংক্রান্ত পদ্ধতি এবং দুর্যোগ মোকাবিলার পদ্ধতি প্রভৃতি। কীভাবে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন মৌলিক এবং নৈতিক উপকরণসমূহ, কোন কোন পর্যায় তাঁরা অতিক্রম করেছিলেন, বইটি আরও জানাবে, কীভাবে কনস্টান্টিনোপলের বিজয় হয়েছিল এবং তাতে আলেম, ফকিহ এবং শাসকগণ অংশগ্রহণ করে কী অবদান রেখেছেন।

বইটি পাঠককে জানাবে, উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান ছিল সর্বক্ষেত্রে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, তথ্যপ্রযুক্তি, যুদ্ধ এবং সমরবিদ্যা—সকল ক্ষেত্রে তাঁদের উন্নতির ছোঁয়া লেগেছিল। বইটি আরও জানাবে ঐ সকল গুণের কথা, একজন নেতা এবং একটি জাতির ক্ষমতায়নের জন্য যে সকল গুণাবলি থাকা অত্যাবশ্যক, যেগুলো হারিয়ে গেলে ক্ষমতাও হারিয়ে যাবে।

বইটি পাঠকের সামনে উন্মোচিত করবে উসমানি সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি এবং প্রকৃত বাস্তবতা। জানাবে, উম্মাহকে উপহার দেওয়া তাদের সকল মহান অবদানের কথা। কীভাবে তাঁরা ইসলামি পবিত্র স্থানসমূহকে পর্তুগিজ

খ্রিষ্টানদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেছে, কীভাবে তাঁরা স্প্যানিশদের ক্রুসেডীয় আক্রমণকে রুখে উত্তর আফ্রিকাবাসীর পরিত্রাতা হয়েছে, কীভাবে তাঁরা আরব অঞ্চলসমূহে ঐক্য সৃষ্টি করেছিল এবং মিসর, শাম প্রভৃতি ইসলামি অঞ্চল থেকে দূর করেছিল পশ্চিমাদের উপনিবেশ, জানাবে সেই গৌরবগাথা। আরও জানাবে, তাঁরা উসমানি সাম্রাজ্যের অনুগত অঞ্চলসমূহে শিয়া মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়ার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের রাষ্ট্রে পরিণত করার চক্রান্তে বাধা প্রদান করেছিল। জানাবে ইউরোপে ইসলাম প্রচারে তাঁদের অবদানের কথা। আলোচনা করা হবে ঐ সকল কারণ সম্পর্কে, যেগুলোর মাধ্যমে উসমানি খিলাফত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যের দুর্বলতায় যেগুলোর প্রভাব পড়েছিল। যেমন : সাম্রাজ্যের শেষভাগে এসে কুরআন এবং সুন্নাহর ভাষা আরবি ভাষার অবমূল্যায়ন, সঠিক ইসলামের শিক্ষা সংরক্ষণ করতে না পারা, আল্লাহর শরিয়ত থেকে সাম্রাজ্যের পিছলে পড়া এবং পশ্চিমা সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।

ওহাবি আন্দোলন এবং উসমানি সাম্রাজ্যের মধ্যকার দ্বন্দ্বের প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। জানানো হবে, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের কল্যাণে মিসর, হেজাজ, শাম প্রভৃতি অঞ্চলে ইসলামি চেতনায় আঘাত হানা মুহাম্মদ আলির ঘৃণ্য প্রচেষ্টার কথা। তার সেই পশ্চিমা সভ্যতা প্রভাবিত আন্দোলনের কথা, যা ছিল উসমানি সাম্রাজ্য ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ থেকে পিছিয়ে পড়ার লক্ষ্যে একটি পরিকল্পিত চক্রান্ত।

মুহাম্মদ আলির ইসলাম বিধ্বংসী রাজনীতির পেছনে ফ্রিম্যাসনদের সমর্থনের ব্যাপারে আলোচনা করা হবে। বইটি আমাদের জানাবে, মুহাম্মদ আলি ছিল উম্মাহর জন্য এক বিষাক্ত থাবা, এক বিষাক্ত খঞ্জর। শত্রুরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যাকে অব্যর্থ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাই মুহাম্মদ আলির জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনৈতিক এবং সামরিক বিপ্লবে তারা পাশে দাঁড়িয়েছিল। এর আগেই তারা মুহাম্মদ আলি এবং তার অনুচরদের ধর্মীয় দুর্বলতা এবং দুর্বল বিশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল।

বইটি জানাবে, মুহাম্মদ আলির এই ভূমিকার ফলেই ইউরোপীয় শক্তি উসমানি সাম্রাজ্যকে দুর্বলতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এর পাশাপাশি তারা রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখে সাম্রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল।

জানাবে, সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের কথা। যিনি তাঁর সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পশ্চিমা সভ্যতার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথ সুগম

করে দিয়েছিলেন। জানাবে, তার পরবর্তী সময়ে ক্ষমতা গ্রহণকারী তার পুত্র আব্দুল মাজিদের কথা। যে ছিল তার উজির রশিদ পাশার অনুগত। যে রশিদ পাশা ছিল ফ্রিম্যাসনদের দোসর। এই উজির তার অনুচরদের নিয়ে তিন-ভাবে সাম্রাজ্যের পশ্চিমায়নকে ত্বরান্বিত করেছিল।

এক. সামরিক বিষয়ে পশ্চিমাদের নীতিমালা চয়ন। **দুই.** সমাজকে ধর্মনিরপেক্ষতা অভিমুখী করা। **তিন.** ইস্তাম্বুলসহ প্রদেশগুলোতে ক্ষমতার কেন্দ্র স্থাপন। জানাবে, তুর্কি ফ্রিম্যাসনদের দুঃসাহসিক পরিকল্পনার কথা—উসমানি সাম্রাজ্যকে ধর্মনিরপেক্ষ করা, আরবি লিপির পরিবর্তে কালখানা ও হুমায়ুনি লিপি প্রচলন এবং ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সাম্রাজ্যকে মাদহাত পাশার সংবিধানের দিকে নিয়ে যাওয়া। ইসলামের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো এমন সংবিধানের মাধ্যমে সাম্রাজ্য পরিচালনা করা হয়, যার উপাত্ত গ্রহণ করা হয়েছিল ফরাসি, বেলজিয়াম এবং সুইস সংবিধান থেকে। এ সকল সংবিধান গঠন করা হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি লক্ষ রেখে।

বইটি পাঠককে জানাবে, কীভাবে শেষদিকে এসে উসমানি সাম্রাজ্যের মতো ইসলামি সাম্রাজ্যে বিভিন্ন আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল, যার ফলে সাম্রাজ্যের সকল নিয়মকানুনকে ধর্মনিরপেক্ষ করা হয়। এ ধরনের নীতিমালা গঠনের জন্য মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। এভাবে সাম্রাজ্য ব্যবসা, রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক অঙ্গনে ইসলামি শরিয়াহ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, এর ফলেই মুসলিমদের দৃষ্টি থেকে উসমানি সাম্রাজ্যের যথার্থতা হারিয়ে যায়।

সুলতান আবদুল আজিজের সময় পশ্চিমা সভ্যতার দোসররা কীভাবে সাম্রাজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাদের চক্রান্তের বিরোধিতা করায় তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল? বইটি জানাবে সেই করুণ উপাখ্যান।

বইটি আলোচনা করবে, সুলতান আবদুল হামিদের বিরাট অবদানের কথা। ইসলামের খেদমতে, সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষায় এবং খিলাফতের পতাকাতলে উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে তাঁর প্রচেষ্টার কথা। জানাবে, সুলতান আবদুল হামিদের সময় কীভাবে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামি ঐক্যের চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলামি ঐক্য ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুলতান আব্দুল হামিদ যেসব উপকরণ গ্রহণ করেছিলেন সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হবে। যেমন : দ্বীন প্রচারকদের সাথে মিলিত হওয়া, সুফি-সাধকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা,

সাম্রাজ্যের আরবীয়করণ, মাদরাসাতুল আশায়ির নির্মাণ, হেজাজের প্রাচীরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং শত্রুদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেওয়া। বইটি গুরুত্বের সাথে জানাবে জার্মান বিদ্রোহী, বলকান জাতীয়তাবাদী দল, কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রোগ্রেস আন্দোলন এবং উসমানি সাম্রাজ্যের প্রত্যেক বিচ্ছিন্নতাবাদী শত্রুদের সমর্থনের পেছনে আন্তর্জাতিক জায়নবাদী আন্দোলনের প্রচেষ্টার কথা। জানাবে, কীভাবে ইসলামের শত্রুরা সুলতান আবদুল হামিদকে অপসারণ করতে সক্ষম হয়েছিল। উসমানি খিলাফতকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে কী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল? কীভাবে খলনায়ক মুস্তফা কামালের আবির্ভাব হয়েছিল সে কথা জানাবে বইটি। যে মুস্তফা কামাল তুরস্ককে ইসলামি বিশ্বাস থেকে হটিয়ে দিয়েছে, ধর্মের সাথে লড়াই করেছে, ধর্মীয় প্রচারকদেরকে নানাভাবে অত্যাচার করেছে এবং আহ্বান করেছে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে।

তুরস্কে ইসলামের সুলক্ষণ এবং ইসলামি আন্দোলনের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া থেকে বইটি বিরত থাকেনি এবং পাঠককে তুরস্ক এবং সমগ্র বিশ্বের ভবিষ্যতে ইসলামের বিচ্ছুরিত আলোর দিকে দৃষ্টিপাত করা থেকে বঞ্চিত করেনি।

বইটির শেষাংশে গুরুত্বের সাথে আলোচিত হবে কুরআনি দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ। পাঠকের কাছে বর্ণনা করবে, সাম্রাজ্যের পতনের কারণসমূহ হচ্ছে—

আল-ওয়ালা ওয়াল বারার মতো আকিদার ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে উম্মাহর সরে যাওয়া। ইবাদতের সঠিক চিন্তা থেকে উম্মাহর পিছিয়ে পড়া। শিরক, বিদআত এবং নানা অপব্যাখ্যার সয়লাব। ইসলামি সমাজব্যবস্থায় বিকৃত সুফিবাদ একটি শক্তিশালী শক্তিরূপে আবির্ভূত হওয়া, যা কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাহ বহির্ভূত আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা এবং ইবাদতের আমদানি করেছে। বইটি মুসলিম পাঠককে উম্মাহকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে শিয়া ইসনা আশারিয়া, নাসিরিয়্যাহ, ইসমাইলিয়্যাহ, কাদিয়ানিয়্যাহ, বাহাইয়্যাহ প্রমুখ ভ্রান্ত দলগুলোর ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করবে। বইটি আলোচনা করবে উম্মাহর ধ্বংসের পেছনে কারণ হচ্ছে, ঐশী নেতৃত্বের অনুপস্থিতি এবং উলামায়ে কেরাম অত্যাচারী শাসকদের হাতের পুতুল বনে যাওয়া। আলেমগণ যখন উচ্চপদ ও মর্যাদা লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে এবং তাঁদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হারিয়ে ফেলবে তখন উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। বইটি জানাবে, কীভাবে উসমানি সাম্রাজ্যের শেষভাগে এসে ধর্মীয় শিক্ষা নিষ্ক্রিয় এবং নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল।

এ বইটি জানাবে, কীভাবে উলামায়ে কেরাম কিতাবের মুখতাসার তথা সংক্ষিপ্ত ভাষ্য, ব্যাখ্যাগ্রন্থ, হাশিয়া এবং তাকরির মুখী হয়ে পড়েছিল এবং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহ থেকে উদ্ভূত ইসলামি প্রকৃত চেতনা থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। বহু আলেম ইজতিহাদের দরজা চালু থাকাকে অস্বীকার করেছিলেন। একপর্যায়ে ইজতিহাদি কার্যক্রম হয়ে গিয়েছিল বিরাট অপরাধতুল্য। মুতাকাল্লিদিন এবং অনাগ্রহীদের কাছে তা কুফরিসম হয়ে পড়েছিল।

বইটি উপস্থাপন করেছে উসমানি সাম্রাজ্যের গ্রন্থিতে ছড়িয়ে পড়া অত্যাচার, বিলাসিতা, প্রবৃত্তির অনুসরণে মত্ততা, অত্যধিক মতানৈক্য এবং বিচ্ছিন্নতার কথা। ফলে সাম্রাজ্য বিপজ্জনকভাবে আল্লাহর শরিয়াহ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল এবং সাম্রাজ্যকে রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, জ্ঞান-বিজ্ঞানগত, চারিত্রিক এবং সামাজিক দুর্বলতা ঘিরে ধরেছিল। জানাবে, কীভাবে এই উম্মাহ শত্রুর প্রতিরোধ এবং ধ্বংস করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, কীভাবে ক্ষমতার শর্তাবলি এবং তার মৌলিক ও নৈতিক উপকরণ হারিয়ে ফেলেছিল এবং কোনো জাতির উত্থান এবং পতনে আল্লাহর রীতিসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে উম্মাহর চেতনা নুইয়ে পড়েছিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

'যদি সে জনপদের লোকেরা ইমান আনত এবং আল্লাহকে ভয় করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান এবং জমিনের বরকতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম, কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাই আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করেছি।' [সুরা আ'রাফ : ৯৬]

আমার এই বিনীত প্রচেষ্টা সমালোচনা এবং আলোচনার উপযুক্ত। এর মাধ্যমে আমি মূলত উসমানি সাম্রাজ্যের সমকালীন ইতিহাসবিদদের থেকে ঘটনাসমূহ একত্রীকরণ, বিন্যস্তকরণ এবং ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। নিজেদের মধ্যকার আকিদা-বিশ্বাস এবং আদর্শিক দ্বন্দ্বের ফলে জনগণের ভেতর সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলনের যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছিল তা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। যদি তা কল্যাণজনক হয়ে থাকে তাহলে তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। যদি কোনো কথায় ভুল হয়ে থাকে, আমাকে তা জানালে অবশ্যই আমি তা থেকে নিজেকে ফিরিয়ে নেব। এ

শিয়া বোয়াইহিয়ারা বাগদাদ এবং আব্বাসীয় খলিফার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিল। তাই সেলজুকরা বোয়াইহিয়াদের বাগদাদ থেকে বিতাড়িত করার পর তাদের সুলতান তুঘরিল বেক খিলাফতে আব্বাসিয়ার রাজধানী বাগদাদে প্রবেশ করলে আব্বাসীয় খলিফা আল-কায়েম বি-আমরিল্লাহ তাকে বিশাল সংবর্ধনা দেন। তাকে সুন্নি পোশাক পরিধান করান। তার পাশে বসান এবং তাকে বহু সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করেন। খলিফা তাকে সুলতান রুকনুদ্দিন তুঘরিল বেক উপাধিতে ভূষিত করেন। আব্বাসীয় খলিফা তুঘরিল বেকের নাম মুদ্রায় অঙ্কন করার নির্দেশ দেন এবং বাগদাদ ও অন্যান্য শহরের মসজিদগুলোতে খুতবায় তার নাম উচ্চারণ করার নির্দেশ দেন, যা সেলজুকদের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দেয়। সে সময় থেকেই সেলজুকরা বাগদাদের বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এবং আব্বাসীয় খলিফাকে তাদের কথামতো পরিচালনা করার দিক দিয়ে বোয়াইহিয়াদের স্থান দখল করে নেয়।[১৬]

তুঘরিল বেক তার শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, তীক্ষ্ণ মেধা এবং কালোত্তীর্ণ বীরত্বের কারণে বেশ সুযোগ-সুবিধা পেতেন। এমনিভাবে তিনি ছিলেন ধার্মিক, খোদাভীরু এবং ন্যায়পরায়ণ। এ জন্যই তিনি তার গোত্রের লোকদের কাছ থেকে বিরাট সমর্থন এবং সাহায্য পেয়েছিলেন। তিনি এক শক্তিশালী বাহিনী প্রস্তুত করেন এবং তুর্কি সেলজুকদের শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অধীনে একতাবদ্ধ করার চেষ্টা করতে থাকেন।[১৭]

আব্বাসীয় খলিফা আল-কায়েম বি-আমরিল্লাহ এবং সেলজুক সর্দার তুঘরিল বেকের মধ্যকার সম্পর্ক আরও জোরদার করার জন্য আব্বাসীয় খলিফা তুঘরিল বেকের বড় ভাই জাফরি বেকের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। এ ছিল ৪৪৮ হিজরি; ১০৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। অতঃপর ৪৫৪ হিজরি; ১০৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তুঘরিল বেক আব্বাসীয় খলিফার এক কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু এরপর খুব বেশি দিন তুঘরিল বেকের জীবনপ্রদীপ জ্বলেনি। ৪৫৫ হিজরি; ১০৬৫ খ্রিষ্টাব্দের রমজান মাসের অষ্টম দিন রাতে তিনি ইনতেকাল করেন। তখন তার বয়স ছিল ৭০। কিন্তু এর আগেই তার হাত ধরে খোরাসান, ইরান এবং ইরাকের উত্তর ও দক্ষিণে সেলজুকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[১৮]

এক. সুলতান মুহাম্মদ আলপ আরসালান (বীর সিংহ উপাধিপ্রাপ্ত)

চাচা তুঘরিল বেকের মৃত্যুর পর আলপ আরসালান রাজত্বের লাগাম তার হাতে তুলে নেন। রাজত্বের ক্ষমতা নিয়ে বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছিল। কিন্তু আলপ আরসালান সেগুলো দমন করতে সক্ষম হন। আলপ আরসালান তার চাচা তুঘরিল বেকের মতোই

[১৬] *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১৯।
[১৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৯।
[১৮] *তারিখুদ দাওলাতিল উলিয়াতিল উসমানিয়্যাহ*, মুহাম্মদ ফরিদ বেক, পৃষ্ঠা : ২৫।

দক্ষ অগ্রবর্তী নেতা ছিলেন। অন্যান্য নতুন অঞ্চল বিজয়ের পূর্বে সেলজুক সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্যসমূহে শাসনের স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি এক বিশেষ নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এমনিভাবে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর জন্য এবং আর্মেনিয়া, রোম প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী খ্রিষ্টানরাজ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রচারে তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। আলপ আরসালান যেসব বিজয় অর্জন করেছিলেন সে ক্ষেত্রে জিহাদি চেতনাই তাকে উজ্জীবিত করেছে। এমনিভাবে জিহাদের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অধীন বহু অঞ্চলে ইসলামি পতাকা উড্ডয়ন করে সেলজুকদের সরদার বনে যান।[১৯]

বহিরাঞ্চলে আক্রমণের পূর্বে সাত বছর নিজ রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অঞ্চলসমূহের শাসন-ব্যবস্থা বিন্যস্ত করতেই তার ব্যয় হয়ে যায়।

যখন তিনি তার অধীন সমস্ত শহর এবং প্রদেশে সম্পূর্ণরূপে সেলজুকদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হন তখন তিনি তার সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য বাস্তবায়নে ছক আঁকতে শুরু করেন, তা ছিল পার্শ্ববর্তী খ্রিষ্টান রাজ্যসমূহ জয় করা, মিসরের ফাতেমীয় (উবাইদিয়্যাহ) খিলাফতের পতন ঘটানো। সমস্ত ইসলামি বিশ্বকে সুন্নি আব্বাসীয় খিলাফতের পতাকাতলে সমবেত করা এবং সেলজুকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এর জন্য তিনি বিশাল একবাহিনী প্রস্তুত করে আর্মেনিয়া এবং জর্জিয়া অভিমুখী হন। সেগুলো জয় করে তার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি সে অঞ্চলে ইসলাম সম্প্রসারণের লক্ষ্যেও কাজ করেন।[২০] আলপ আরসালান শামের উত্তরাঞ্চলে আক্রমণ করেন এবং হালবের (আলেপ্পো) মুরাদিসিয়্যাহ সাম্রাজ্য অবরোধ করেন। ৪১৪ হিজরি; ১০২৩ খ্রিষ্টাব্দে সালেহ বিন মুরদাস শিয়া মাজহাবের ওপরে ভিত্তি করে এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আলপ আরসালান সেখানকার শাসক মাহমুদ বিন সালেহ বিন মুরদাসকে ৪৬২ হিজরি; ১০৭০ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমীয় উবাইদিয়্যাহ খলিফার পরিবর্তে আব্বাসীয় খলিফার কর্তৃত্ব মেনে নিতে বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি তার তুর্কি সেনাপতি আতানসাজ বিন আওক আল-খাওয়ারেজমিকে শামের দক্ষিণাঞ্চলে আক্রমণ করতে প্রেরণ করেন। তিনি ফাতেমীয়দের হাত থেকে রামলা এবং বাইতুল মুকাদ্দাস ছিনিয়ে আনেন। কিন্তু আসকালান দখল করতে সক্ষম হননি। আসকালানকে মিসরের প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এই অভিযানের মাধ্যমে সেলজুকরা আব্বাসীয় খলিফার নিয়মকানুনের নিকটবর্তী হয় এবং সেলজুক সুলতান বাইতুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন।[২১]

---

[১৯] *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ২০।

[২০] *আস-সালাজিকু ফিল মাশরিকিল আরাবি*, ড. ইসাম মুহাম্মদ, পৃষ্ঠা : ২৫।

[২১] *নিযামুল জামান*, বসত বিন জাওযি, পৃষ্ঠা : ১৬১।

৪৬২ হিজরিতে মক্কার শাসক মুহাম্মদ বিন আবি হাশেম সুলতান আলপ আরসালানের কাছে দূত প্রেরণ করে সংবাদ পাঠান যে, সেখানে খলিফা আল-কায়েম বিল্লাহ এবং সুলতানের নামে খুতবা জারি করা হয়েছে এবং মিসরের উবাইদিয়্যাহদের নামে খুতবা বাদ দেওয়া হয়েছে এবং আজানে *'হাইয়্যা আলাল আমল'* বলা ত্যাগ করা হয়েছে। এ সংবাদ পেয়ে সুলতান তাকে ৩০ হাজার দিনার উপহার দেন এবং তাকে বলেন, মদিনার শাসক যদি এমন করে তাহলে তাকে ২০ হাজার দিনার উপহার দেওয়া হবে।[২২]

আলপ আরসালানের বিজয়সমূহ রোমের সম্রাট ডোমান্স ডিওজিন্সকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। সে তার সাম্রাজ্য রক্ষায় আলপ আরসালানের বিরুদ্ধে আক্রমণের সংকল্প করে। তার বাহিনী সেলজুকদের সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এর মধ্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ৪৬৩ হিজরি মোতাবেক ১০৭০ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সংঘটিত হওয়া মালাজগির্দের যুদ্ধ।[২৩]

ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'এ যুদ্ধে রোম সম্রাট ডোমান্স রোম, রুশ এবং ফ্রান্স থেকে পর্বতসম সেনাবাহিনী নিয়ে আগমন করে। তারা সংখ্যায় ছিল বিশাল পরিমাণ। তার সাথে ৩৫ হাজার ব্যাটালিয়ন ছিল। তাদের ২ লাখ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তাদের সাথে ৩৫ হাজার ফরাসি সৈন্য ছিল এবং কনস্টান্টিনোপলে বসবাসকারী যোদ্ধা ছিল ১৫ হাজার। তাদের সাথে ১ লাখ শ্রমিক এবং চৌকিদার ছিল।[২৪] ১ হাজার দৈনিকশ্রমিক এবং ৪০০ শ্রমিক ছিল তাদের জুতা-পোশাক ইত্যাদি বহন করার জন্য এবং ২ হাজার শ্রমিক ছিল অস্ত্র, বর্শা, মিনজানিক ইত্যাদি বহনের জন্য। সেখানে একটি মিনজানিক ছিল, যা ১২০০ শ্রমিককে বহন করতে হতো। ইসলাম এবং মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করার নিন্দনীয় এ প্রয়াস আল্লাহ তাআলা ব্যর্থ করে দেন। তার সৈন্যরা বাগদাদ পৌঁছার পূর্বেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার সহকারী খলিফার ব্যাপারে কল্যাণের পরামর্শ দেয়। তাকে বলে, আপনি ওই বৃদ্ধের প্রতি নমনীয় হোন। তিনি আমাদেরই সঙ্গী। অতঃপর খোরাসান এবং ইরাক অঞ্চল তাদের জন্য মজবুত হয়ে গেলে তারা এককভাবে শাম এবং সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি আক্রমণমুখী হয়। অঞ্চলটি তারা মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। আর ভাগ্যের সিদ্ধান্ত ছিল, 'তোমার জীবনের শপথ, নিশ্চয়ই তারা তাদের উন্মত্ততায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে'। *[সুরা হিজর, আয়াত : ৭২]*

সুলতান আলপ আরসালান তার বাহিনী নিয়ে জাহওয়া নামক স্থানে জিলকদের ২৫ তারিখে বৃহস্পতিবার দিন রোম সম্রাটের মুখোমুখি হন। তার বাহিনী ছিল প্রায় ২০ হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে। সুলতান রোমীয় সেনাবাহিনীর আধিক্য দেখে ভয় পেয়ে যান। তখন ফকিহ আবু নাসর মুহাম্মদ বিন আবদুল মালেক বুখারি ইঙ্গিত দেন যে, যুদ্ধ যেন

[২২] *আ ইয়াহিদুত তারিখু নফসুহু*, মুহাম্মদ আল-আবদাহ, পৃষ্ঠা : ৬৭।
[২৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২০।

শুক্রবার দিন জুমার সময় শুরু করা হয়, যেন খতিবগণ মুজাহিদদের জন্য দোয়া করতে পারেন। নির্দিষ্ট সময় চলে এলে উভয় দল মুখোমুখি হয়। সুলতান তার ঘোড়া থেকে নেমে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। চেহারা মাটিতে লাগিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। মুসলিমগণের উপর আল্লাহ তাআলার সাহায্য বর্ষিত হয়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের শক্তি দান করা হয়। ফলে তারা খ্রিষ্টানদের বহুসংখ্যক যোদ্ধাকে হত্যা করে। তাদের সম্রাট ডোমান্স বন্দি হয়। এক রোমীয় গোলাম তাকে বন্দি করে। রোম সম্রাট আলপ আরসালানের সামনে দাঁড়ালে তিনি তাকে তিনটি চড় মারেন এবং বলেন, যদি আমি আপনার সামনে বন্দি অবস্থায় দাঁড়াতাম তাহলে আপনি কী করতেন? সে বলল, যত মন্দ কাজ আছে সব করতাম। সুলতান বললেন, তাহলে আপনার কী ধারণা, আমি আপনাকে কী করতে পারি? সে বলল, হয়তো আপনি আমাকে হত্যা করে আপনার সাম্রাজ্যে আমাকে কুখ্যাত করে দেবেন, নয়তো আপনি ক্ষমা করে দিয়ে মুক্তিপণ আদায় করে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। সুলতান বললেন, আমি ক্ষমা এবং মুক্তিপণ ব্যতীত অন্য কিছু ভাবিনি। তাকে দেড় লাখ দিনারের বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হয়। সে সুলতানের সামনে বিশ্রাম নেয় এবং সুলতান তাকে বিশেষ পানীয় পান করান। সে সুলতানের বড়ত্ব এবং মহত্ব প্রকাশ করার জন্য সুলতানের সামনে জমিনে চুমু দেয়। সুলতান তাকে সফরে ব্যয় করার জন্য ১০ হাজার দিনার দান করেন। তার সাথে একদল সেনাপতি এবং সৈন্যকেও মুক্ত করে দেন। সফরের নিরাপত্তার জন্য সাথে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, যাতে তিনি সাম্রাজ্য পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছতে পারেন। তাদের সাথে একটি পতাকা ছিল। যার মধ্যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' লেখা ছিল।[২৫]

রোম সম্রাট ডোমান্সের ২ লাখ সৈন্যের বিপরীতে আলপ আরসালানের মাত্র ১৫ হাজার সৈন্যের এ বিজয় ছিল ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া ঘটনা। কেননা এ যুদ্ধে রোমীয়দের দুর্বলতায় এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া সহজ হয়ে গিয়েছিল। আর এগুলো ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, যা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল এবং মূলঘাঁটি ছিল। উসমানিদের হাতে সম্পূর্ণরূপে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য দখলে এ বিজয় সহায়ক হয়েছে।

আলপ আরসালান ছিলেন একজন সৎলোক। তিনি আধ্যাত্মিক এবং বস্তুগত সাহায্যের উপকরণসমূহ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উলামায়ে কেরামের সাহচর্য গ্রহণ করতেন। তাদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করতেন। মালাজগির্দের যুদ্ধে বুজুর্গ আলেম আবু নাসর মুহাম্মদ বিন আব্দুল মালেক বুখারি কতইনা চমৎকার উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি সেদিন আলপ আরসালানকে বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই আপনি এমন দ্বীনের পক্ষে লড়াই

[২৫] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১৬/১০৮।

করছেন, আল্লাহ তাআলা যে দ্বীনকে সাহায্য করা এবং অন্যান্য সকল দ্বীনের উপর বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি আশা করছি, আল্লাহ তাআলা আপনার হাতে এই বিজয় তুলে দেবেন। তাই আপনি জুমআর দিন যে সময় খতিবগণ মিম্বারে উপবিষ্ট হবেন তখন তাদের সাথে যুদ্ধে মুখোমুখি হবেন। কেননা তখন সকলে মুজাহিদগণের জন্য দোয়া করবেন।

সে সময় চলে এলে তিনি তাদের নিয়ে নামাজ আদায় করেন। সুলতান ক্রন্দন শুরু করলে তার ক্রন্দন দেখে অন্যান্য সৈন্যরাও কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। তিনি দোয়া করেন। সবাই আমিন আমিন বলতে থাকে। সুলতান বলেন, যে ফিরে যেতে চায় সে যেন ফিরে যায়। এখানে এমন কোনো সুলতান নেই যিনি আদেশ দেবেন, কিন্তু নিষেধ করবেন না। তিনি তির ধনুক ফেলে দিয়ে তরবারি হাতে তুলে নেন। নিজ হাতে ঘোড়ার লেজ বেঁধে নেন। তার সৈন্যরাও অনুরূপ করে। তিনি বর্ম এবং সাদা পাগড়ি পরিধান করেন এবং বলেন, যদি আমি নিহত হই, তাহলে এটাই আমার কাফন।[২৯]

আল্লাহু আকবার! এমন লোকদের উপরেই তো আল্লাহ তাআলার সাহায্য অবতীর্ণ হয়।

এই সুলতান ১০৭২ খ্রিষ্টাব্দে, ১০ রবিউল আউয়াল ৪৬৫ হিজরি ইউসুফ খাওয়ারেজমি-নামক এক বিদ্রোহীর হাতে নিহত হন। মার্ভ শহরে তার পিতার কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। ছেলে মালিক শাহ তার স্থলাভিষিক্ত হন।[৩৭]

সুলতান আলপ আরসালানের কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

তিনি ছিলেন দয়ালু হৃদয়ের, দরিদ্রের সহায়, আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের জন্য সর্বদা অধিক পরিমাণে দোয়া করতেন। একদিন তিনি মার্ভে প্রতিবন্ধী অসহায়দের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের দেখে কেঁদে ফেলেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করেন, যেন আল্লাহ তাকে অনুগ্রহ করে ধনী বানিয়ে দেন। তিনি অধিক পরিমাণে দান করতেন। রমজান মাসে ১৫ হাজার দিনার দান করতেন। তার রেজিস্ট্রি খাতায় সাম্রাজ্যের সকল অঞ্চলের দরিদ্র ও অসহায়দের নাম লেখা ছিল। তাদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা ছিল। সমস্ত সাম্রাজ্যে কোনো অপরাধ এবং ঝগড়া-ফ্যাসাদ ছিল না। তিনি জনগণের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের কাছ থেকে শুধু মূল কর অর্থাৎ বাৎসরিক দুই বার কর নিয়েই বিরত থাকতেন।[৩৮]

একজন তার কাছে অভিযোগ করে উজির নিজামুল মুলকের ব্যাপারে চিঠি লেখে এবং সাম্রাজ্যে তার আচরণের ব্যাপারে উল্লেখ করে। সুলতান নিজামুল মুলককে ডেকে

---

[২৬] *তারিখুল ইসলাম*, ইমাম যাহাবি, ৪৬১ থেকে ৪৭০ হিজরির ঘটনা এবং মৃত্যুসমূহের আলোচনা, পৃষ্ঠা : ২।
[২৭] *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ২১।
[২৮] *আল-কামিল*, ইবনে আসির, ৬/২৫২।

পাঠান এবং তাকে বলেন, এই ধরুন, যদি এই অভিযোগ সত্য হয়ে থাকে তাহলে আপনি আপনার চরিত্র উন্নত করুন এবং অবস্থা সংশোধন করুন। আর যদি মিথ্যে হয় তাহলে তার ভুল ক্ষমা করে দিন। তিনি জনগণের সম্পদ সংরক্ষণে আগ্রহী ছিলেন। একবার তার কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, তার গোলামদের মধ্যে এক গোলাম তার এক সঙ্গীর ইজার চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। তিনি তাকে শূলীতে চড়ান। এমন শাস্তির ভয়ে সকল ক্রীতদাস থরথর করে কেঁপে ওঠে।[৯৯]

প্রায় সময় তার সামনে পূর্বেকার রাজা-বাদশাহগণের ইতিহাস এবং তাদের আদবসমূহ, শরিয়তের হুকুমসমূহ পাঠ করা হতো। সাম্রাজ্যে তার চরিত্রসুষমার কথা, চুক্তিরক্ষার কথা ছড়িয়ে পড়লে জনগণ নিশ্চিন্তে তার আনুগত্য প্রদর্শন করে। আগে অস্বীকৃতি জানালেও এবার তারা আনুগত্য মেনে নিতে সম্মত হয় এবং মা-ওরাউন্নাহার থেকে শুরু করে শামের দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে তার কাছে লোকসমাগম হতে শুরু করে।[১০০]

দুই. মালিক শাহ এবং খিলাফত ও সালতানাতের সমন্বয়ে তার ব্যর্থতা

আলপ আরসালানের মৃত্যুর পর তার পুত্র মালিক শাহ সালতানাতের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তার চাচা কিরমানের সেলজুকি শাসক কাওরুদ বিন জাফরি তার বিরোধিতা করেন এবং সালতানাতের ক্ষমতা তলব করেন। হামজানের নিকটবর্তী এক স্থানে তাদের দুজনের মাঝে সংঘর্ষ হয়। এতে কাওরুদ পরাজিত এবং নিহত হয়। এর মাধ্যমে কিরমানের সেলজুক সাম্রাজ্যের ওপরও মালিক শাহের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। ৪৬৫ হিজরি; ১০৭৩ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান শাহ বিন আলপ আরসালানকে সেখানকার প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়।

সুলতান মালিক শাহের শাসনামলে সেলজুকী সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করে। পূর্বে আফগানিস্তান, পশ্চিমে এশিয়া মাইনর, দক্ষিণে শাম অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর সূচনা হয়েছিল ৪৬৮ হিজরি; ১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তার সেনাপতি আতসাজের হাতে দামেশকের পতনের পর থেকে। তার সময়ে আব্বাসীয় খলিফার আহ্বান প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বিজয়ের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার জন্য মালিক শাহ ৪৭০হিজরি; ১১৭৭ খ্রিষ্টাব্দে শামের বিজিত অঞ্চলসমূহে তার ভাই তাজুদ্দৌলা তাতমাশের নিকট সমর্পণ করেন। অবশেষে এই তাজুদ্দৌলা শামের সেলজুক সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করে। এমনিভাবে মালিক শাহ সুলাইমান বিন কাতলামাশ বিন ইসরাইল নামক তার এক নিকটাত্মীয় ব্যক্তিকে এশিয়া মাইনরের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। ৪৭০ হিজরি; ১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দে এ অঞ্চলের অধীনে রোম বিজিত হয়। এই ব্যক্তি রোমে সেলজুক সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন

[৯৯] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১২/১১৪।
[১০০] *আল-কামিল লি ইবনি আসির*, পৃষ্ঠা : ২৯।

করেন।[৩১] ২২৪ বছর ধরে এই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ছিল। এই সময়ে আবুল ফাওয়ারেস কুতলামাসের বংশধরদের মধ্য হতে ১৪ জন ব্যক্তি একের পর এক শাসন করেছেন। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি ছিলেন সুলাইমান বিন কুতলামাশ। যাকে এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গণ্য করা হয়।[৩২] তিনি ৪৭৭ হিজরি; ১০৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এনতাকিয়া বিজয়ে সক্ষম হন। এমনিভাবে তার পুত্র দাউদ ৪৮০ হিজরি; ১০৮৭ খ্রিষ্টাব্দে কোনিয়া দখল করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। কোনিয়া ছিল এশিয়া মাইনরে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সবচেয়ে প্রাচুর্যশালী এবং সুন্দর শহর। সেলজুকরা এই শহরটিকে বাইজেন্টাইন খ্রিষ্ট শহর থেকে সেলজুকী ইসলামি শহরে রূপান্তর করে। ৭০০ হিজরি; ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গোলীয়দের হাতে এই সাম্রাজ্যের পতন হয়।[৩৩] পরবর্তী সময়ে এ সাম্রাজ্য উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রোমের সেলজুক সাম্রাজ্য এশিয়া মাইনরের ভিতরিক দখলে এবং সেখানে সুন্নি ইসলাম ধর্মের প্রচারে আগ্রহী ছিল। সে সকল অঞ্চলে ইসলামি সভ্যতার স্থাপনে তাদের অবদান ছিল। তারা প্রাচ্যে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের প্রতিরক্ষা প্রদানকারী রূপরেখার অবসান ঘটান।[৩৪]

মালিক শাহের আমলে এই শক্তিশালী সাম্রাজ্য থাকা সত্ত্বেও তার সেনাপতি আতসাজ শাম এবং মিসরকে সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হননি। যদিও সেলজুকরা মিসরের অভ্যন্তরে ফাতেমীয় উবাইদিয়্যাহ সাম্রাজ্যকে কার্যত হুমকি দিয়ে রেখেছিল।

আতসাজ মিসর যুদ্ধের ইচ্ছা করলে ফাতেমীয় উবাইদিয়্যাহ সাম্রাজ্যের উজির বদর জামালির বিরাট বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার আগেই আরবের এক সৈন্যদলের হাতে পরাজিত হন। এ ছিল ৪৬৯ হিজরি; ১০৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ঘটনা। আতসাজের এই ব্যর্থতা সাম্রাজ্যকে অধিক বিচ্ছিন্নতা, বিভক্তি এবং ক্রমাগত চলমান গৃহযুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। ৪৭১ হিজরি; ১০৭৮ খ্রিষ্টাব্দে তার হত্যাকাণ্ডের মধ্যদিয়ে এর অবসান ঘটে।[৩৫]

এমনিভাবে মালিক শাহ খিলাফতে আব্বাসিয়াকে তার সেলজুকি পরিবারে স্থানান্তরিতকরণে সফল হতে পারেননি। তিনি ৪৮০ হিজরি; ১০৮৭ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা মুকতাদি বি-আমরিল্লাহর কাছে তার এক মেয়েকে বিবাহ দেন। এ ঘর থেকে একটি সন্তান হয়। এমনিভাবে তিনি তার অপর মেয়েকে মুসতাজহির আব্বাসির কাছে বিবাহ দেন। তবে তার দৌহিত্রদের মাঝে খিলাফত এবং সালতানাতের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকেনি।[৩৬]

---

[৩১] *আস-সালাতিনু ফিল মাশরিকিল আরাবি*, পৃষ্ঠা : ২৮।
[৩২] *আস-সালাতিনু ফিল মাশরিকিল আরাবি*, পৃষ্ঠা : ২৯।
[৩৩] প্রাগুক্ত।
[৩৪] *আস-সালাতিনু ফিল মাশরিকিল আরাবি*, পৃষ্ঠা : ২৯।
[৩৫] *মিরয়াতুজ জামান, সাবত বিন জাওযি*, পৃষ্ঠা : ১৮২।
[৩৬] *আস-সালাতিনু ফিল মাশরিকিল আরাবি*, পৃষ্ঠা : ৩০।

ইনতেকাল

৪৪৭-৪৮৫ হিজরি; ১০৫৫-১০৯২ পর্যন্ত শাসন করে সুলতান মালিক শাহের মৃত্যু হয়। এর মধ্যদিয়েই সেলজুক সালতানাতের প্রথম তিন সুলতান যথাক্রমে তুঘরিল বেক, আলপ আরসালান এবং মালিক শাহের শাসনামলে অর্জিত শক্তি ও মর্যাদার অধ্যায়ের অবসান ঘটে। এখান থেকেই এই সাম্রাজ্যের দুর্বলতা এবং অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়। আলপ আরসালান এবং মালিক শাহের শাসনামলে উজির নিজামুল মুলকের আবির্ভাব ঘটে। সেলজুক সাম্রাজ্যের শক্তিমত্তায় তার অবদান এবং তার জীবনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিন. নিজামুল মুলক

ইমাম জাহাবি তার সম্পর্কে বলেন, 'বিরাট ক্ষমতাধর উজির নিজামুল মুলক, কিওয়ামুদ্দিন আবু আলি আল-হাসান বিন আলি বিন ইসহাক আত-তুসি। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সৌভাগ্যবান, ধার্মিক, সম্ভ্রান্ত এবং কারি ও ফকিহগণের মজলিসের স্থপতি।

তিনি বাগদাদে বিশাল একটি মাদরাসা নির্মাণ করেন। নিসাপুরে নির্মাণ করেন অপর আরেকটি মাদরাসা। আরেকটি নির্মাণ করেন তুসে। তিনি জ্ঞানচর্চায় আগ্রহী ছিলেন। ছাত্রদের জন্য ভাতা জারি করেছেন। হাদিস লিপিবদ্ধ করিয়েছেন এবং তা থেকে ভুল-ত্রুটির অপনোদন করিয়েছেন।[৩৭]

তার অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে তিনি সুলতান আলপ আরসালানের উজির হয়ে যান। পরবর্তী সময়ে আলপ আরসালানের ছেলে মালিক শাহের উজির মনোনীত হন। তিনি যেভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনা করা উচিত সেভাবে তার সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। জুলুম নিয়ন্ত্রণ করেন। জনগণের প্রতি দরদি হন। অনেক ওয়াকফসংস্থা নির্মাণ করেন। বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তার নিকট হিজরত করে চলে আসতেন।[৩৮]

তিনি সুলতান মালিক শাহকে পরামর্শ দেন, যেন তিনি চরিত্রবান, ধার্মিক এবং বীরত্বপূর্ণ লোকদেরকে সেনাপতি এবং মন্ত্রীসভায় মনোনীত করেন। তার এই নীতির সুফল পরবর্তী সময়ে প্রকাশ পায়। তার মনোনীত সেনাপতিদের একজন ছিলেন আক সুংকুর। যিনি ছিলেন নুরুদ্দিন মাহমুদের দাদা। আক সুংকুর হালব দিয়ারে বকর এবং আরব উপদ্বীপের প্রশাসক নিযুক্ত হন। তার সম্পর্কে ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'তিনি ছিলেন চারিত্রিকভাবে সর্বোত্তম শাসক এবং শারীরিক দিক দিয়ে সবচেয়ে সুঠাম দেহের

[৩৭] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৯/৯৪।
[৩৮] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৯/৯৫।

অধিকারী'।[৩৯] তার ছেলে ইমাদুদ্দিন জিনকি ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সূচনা করেন। তার পরে নুরুদ্দিন মাহমুদ এ কাজ আনজাম দেন। এই পরিবারই ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সালাহ উদ্দিন, আজ-জাহের বাইবারস, কালাউন প্রমুখ বীরদের বিজয়ের ভিত্তি স্থাপন করে এবং ইসলামি বিশ্বে একতাবদ্ধতার দুয়ার খুলে দেয়।[৪০]

আক সুংকুর আল-বারসাকি ছিলেন সেলজুক সুলতান মাহমুদের অধীন একজন সেনাপতি। তিনি মুসেলের গভর্নর ছিলেন। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ৫২০ হিজরিতে বাতেনিয়্যাহরা তাকে হত্যা করে। তখন তিনি মুসেলের বড় জামে মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন। ইবনে আসির তার সম্পর্কে বলেন, 'তিনি ছিলেন একজন উত্তম তুর্কি ক্রীতদাস। তিনি আহলে ইলম এবং সৎ-লোকদের ভালোবাসতেন। ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করতেন। তিনি ছিলেন একজন উত্তম শাসক। সময়মতো নামাজ আদায় করতেন। রাতে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতেন।'[৪১]

ইতিহাসবিদ আবু শামা আমাদেরকে সেলজুক শাসনামলের অবদান, বিশেষ করে নিজামুল মুলকের আমলের অবদান সম্পর্কে জানিয়েছেন, তিনি বলেন, 'সেলজুকিদের ক্ষমতা গ্রহণের পর তারা খিলাফতের চিত্র পাল্টে দেয়। বিশেষ করে উজির নিজামুল মুলকের সময়ের কথা উল্লেখযোগ্য। কেননা তিনিই সাম্রাজ্যের রীতি এবং নিয়ন্ত্রণ সর্বোত্তম পর্যায়ে নিয়ে যান।[৪২]

সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক বিষয়ে তার নিয়ন্ত্রণ

মালিক শাহ ক্ষমতা গ্রহণের পর সামরিক ব্যাপারে গুরুত্ব দেন এবং জনগণের সম্পদের ওপর তার হস্ত প্রসারণ শুরু করেন। জনগণ তখন বলতে লাগল, আমরা নিজামুল মুলক ব্যতীত সুলতানকে কোনো সম্পদ দেবো না। এতে করে অবস্থা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নিজামুল মুলক সুলতানকে এ কথা জানান এবং এ কাজে দুর্বলতা, প্রভাবের পতন, সাম্রাজ্যের অবনতি এবং রাজনৈতিক অধঃপতনের শঙ্কা ব্যক্ত করেন। তিনি তাকে বলেন, আপনি যা কল্যাণকর মনে করেন তাই করুন। তখন নিজামুল মুলক তাকে বলেন, আপনার আদেশ ব্যতীত আমার জন্য এ কাজ করা সম্ভব নয়। সুলতান বলেন, 'আমি সকল ছোট বড় বিষয়ের ক্ষমতা আপনার হাতে তুলে দিলাম'। আপনিই দায়িত্বশীল। তিনি তার জন্য শপথ করেন এবং তার ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে দেন। তাকে সম্মানজনক পোশাক পরিয়ে দেন এবং অনেকগুলো উপাধিতে ভূষিত করেন। একটি উপাধি ছিল আতাবেক; এর অর্থ হচ্ছে অভিভাবক এবং শাসক। এভাবেই তার দক্ষতা,

---

[৩৯] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১২/১৫৮।

[৪০] *আ ইয়াযিদুত তারিখু নফসুহু*, পৃষ্ঠা : ৬৮।

[৪১] *আল-কামিল*, ১০/৬৩৩, *আ ইয়াযিদুত তারিখু নফসুহু*, পৃষ্ঠা : ৬৮ এর উদ্ধৃতি দিয়ে।

[৪২] *আর-রওজাতান ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, ১/৩১, *আ ইয়াযিদুত তারিখু নফসুহু* এর উদ্ধৃতি দিয়ে।

বীরত্ব এবং উত্তম চরিত্র প্রকাশ পায়, যা লোকদের অন্তরসমূহকে শীতল করে। একবার এক অসহায় মহিলা এসে তার কাছে সাহায্য কামনা করেন। বৃদ্ধা তার সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলেন। বৃদ্ধার কাজকে অপছন্দ করে এক প্রহরী এসে বৃদ্ধাকে সরিয়ে দিতে চাইলেন। নিজাম প্রহরীকে বললেন, আমি তোমাকে তাদের খেদমতে নিয়োগ করেছি। কেননা আমির এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের তোমার কাছে কোনো প্রয়োজন নেই। এরপর তিনি বৃদ্ধার প্রয়োজন পূরণ করে দেন এবং প্রহরীকে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করেন।[৪৩]

ইলমের প্রতি তার ভালোবাসা, উলামায়ে কেরামের প্রতি সম্মান এবং বিনয়

তিনি ইলম অর্জন ভালোবাসতেন। বিশেষ করে তিনি হাদিসের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি বলতেন, 'আমি হাদিস বর্ণনার যোগ্য নই তা জানি, কিন্তু আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস বর্ণনাকারীদের কাতারে সংযুক্ত হতে চাই।[৪৪] তিনি কুশাইরি, আবু মুসলিম বিন মাহর বাজদ এবং আবু হামিদ আল-আজহারি থেকে হাদিস শ্রবণ করেছেন।[৪৫]

তিনি যে সকল মাদরাসা নির্মাণ করেছিলেন সেগুলোতে তার অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিলেন। যখন শাফেয়ি মাজহাবের ফকিহ আবুল হাসান মুহাম্মদ বিন আলি আল-ওয়াসেতি তার কাছে কিছু পংক্তি প্রেরণ করে তাকে হাম্বলি ও আশআরিদের মাঝে বিদ্যমান ফিতনা দমনে উৎসাহ প্রদান করেন, তখন নিজামুল মুলক এই ফিতনা দমন করেন। আবুল হাসান আল-ওয়াসেতি তাকে নিম্নে লিখিত পংক্তিগুলো পাঠিয়েছিলেন—

'হে নিজামুল মুলক, বাগদাদে বিপর্যয় নেমে এসেছে
সেখানে আপনার নিযুক্ত সন্তান লাঞ্ছিত অপমানিত হচ্ছে,
সেখানে আমরা তার জন্য একের পর এক নিহত গোলাম সঁপে দিচ্ছি
তাদের মাঝে যে নিরাপদ, তার বুকেও তির গেঁথে আছে।
হে দ্বীন প্রতিষ্ঠাকারী, বাগদাদে আর কোনো স্থান বাকি নেই
সবখানেই বিপদ বেড়ে গেছে এবং সার্বক্ষণিক যুদ্ধ লেগে আছে,
তাই আপনার দুটি রক্ষক হাত কখন এ অসুখের উপশম করবে?
জাতিকে বাগদাদের হত্যা এবং বিগ্রহ থেকে উদ্ধার করবে?

[৪৩] *আল-কামিল, ইবনে আসির*, ২/২৫২।
[৪৪] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১২/১৫০।
[৪৫] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৯/৯৫।

সেখানকার মাদরাসা এবং তার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই সালাম, অতঃপর মসজিদে হারামের প্রান্তর আঁকড়ে ধরার জন্য রইল শুভকামনা।[৪১]

তার সভাগুলো ছিল উলামায়ে কেরাম এবং ফকিহগণের পদচারণায় মুখরিত। দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি তাদের সাথেই অতিবাহিত করতেন। তাকে বলা হয়েছিল, 'ওই সকল লোক আপনাকে অনেক কল্যাণ থেকে ব্যস্ত করে রাখছে'। তিনি উত্তর দিলেন, 'তারাই হচ্ছেন দুনিয়া ও আখিরাতের সৌন্দর্য। তাদের যদি আমার মাথায় বসাই তাহলে এতে কোনো অতিরঞ্জন হবে না'। তার কাছে আবুল কাসেম কুশাইরি এবং আবুল মা'আলি জুয়াইনি আসলে তিনি তাদের সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাদেরকে তার সাথের আসনে বসাতেন। আবু আলি আল-ফারনাদি আগমন করলে তিনি তার সম্মানে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তাকে স্বীয় আসনে বসিয়ে দিয়ে তিনি তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতেন। তার এ কাজ রাজদরবারের লোকজন অপছন্দ করে তাকে তিরস্কার করে। তখন তিনি বলেন, আবুল কাসেম এবং আবুল মা'আলি তারা দুজন আমার কাছে এলে তারা আমার প্রশংসা করেন। আমাকে সম্মান করেন এবং আমার ব্যাপারে এমন বাড়িয়ে বলেন যা আমার মাঝে নেই। তাই আমি তাদের সাথে তেমন আচরণ করি যা মানুষের অন্তরে উদ্রেক হয়। আর আবু আলি আল-ফারনাদি আমার কাছে এলে তিনি আমার দোষ-ত্রুটি এবং জুলুম-অবিচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। ফলে আমি বিনয়াবনত হয়ে যাই এবং আমি যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি করি তার অধিকাংশ থেকেই ফিরে আসি।[৪৭]

ইবনে আসির তার সম্পর্কে বলেন, 'তিনি ছিলেন আলেম, ধার্মিক, দানশীল, ন্যায়পরায়ণ, সহনশীল, অধিকাংশ সময় অপরাধীদের ক্ষমাকারী এবং দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বনকারী। তার মজলিস আলেম, ফকিহ, ইমাম এবং নেককার লোকদের পদচারণায় মুখরিত থাকত।[৪৮]

তিনি ছিলেন কুরআনের হাফেজ। ১১ বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। শাফেয়ি মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি অজু ছাড়া থাকতেন না। অজু করলেই তিনি নফল নামাজ আদায় করতেন।[৪৯] মুআজ্জিনের আজান শুনতে পেলেই সকল কাজ ছেড়ে দিতেন, নামাজ আদায়ের পূর্বে অন্য কোনো কাজ শুরু করতেন না। মুআজ্জিন সঠিক সময়ে আজান দিতে ভুলে গেলে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিতেন। এ ছিল সার্বক্ষণিক ওয়াক্তমতো নামাজ আদায়কারীগণের সবচেয়ে উঁচু স্তর।[৫০] আল্লাহ তাআলার সাথে

[৪৬] *আল-কামিল*, ৬/২৭৬।
[৪৭] *আল-কামিল*, ৬/৩৩৭।
[৪৮] প্রাগুক্ত।
[৪৯] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১২/১৫০।
[৫০] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৯/৯৬।

তার অনেক মহব্বতের সম্পর্ক ছিল। তিনি একবার বলেন, আমি একরাতে স্বপ্নে ইবলিসকে দেখতে পেলাম। আমি তাকে বললাম, ধ্বংস হও, তোমাকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন এবং সরাসরি সিজদার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তুমি তা অস্বীকার করেছ। আর আমাকে তিনি সরাসরি সিজদা করার নির্দেশ দেননি, তবুও প্রতিদিন বহুবার আমি তার জন্য সিজদা দিই। তিনি বলতেন—

'যে ব্যক্তি সর্বদা রোজা রাখায় অভ্যস্ত হবে না
তবে তার সকল ভাল কাজই গোনাহে পরিণত হবে'।[৫১]

তিনি চাইতেন, তার জন্য একটি মসজিদ থাকবে, যেখানে তিনি সর্বদা আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবেন এবং তাতে জীবনধারণের মতো পরিমিত রিজিক থাকবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি চাই ছোট্ট গ্রামে একটি মসজিদ থাকবে, যেখানে আমি দুনিয়ার সবকিছু পরিত্যাগ করে নির্বিঘ্নে আমার প্রভুর ইবাদত করব।'[৫২]

তার বিনয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একরাতে তিনি খাবার খাচ্ছিলেন। তার ভাই আবুল কাসেম তার একপাশে ছিলেন। আর অপর পাশে খোরাসানের গভর্নর ছিলেন। গভর্নরের পাশে একজন কর্তিত হাতবিশিষ্ট অসহায় ব্যক্তি ছিলেন। নিজামুল মুলক দেখলেন যে, গভর্নর সেই অসহায় লোকটির সাথে বসে খেতে চাচ্ছেন না। তাই তিনি তাকে পার্শ্ব পরিবর্তনের আদেশ দিয়ে নিজে গিয়ে সেই অসহায় ব্যক্তির কাছে বসলেন এবং তার সাথে খাবার খেলেন।

তার অভ্যাস ছিল খাবারের সময়ে অসহায় ব্যক্তিদের ডেকে আনা এবং তাদের নিকটে বসানো।[৫৩]

তার কিছু কবিতা—

'আশির পরে কোনো শক্তি থাকে না
দূরে চলে যায় তারুণ্যের উত্তেজনা
যেন আমি এমন এক প্রাণ
আমার হাতে মুসার লাঠি কিন্তু নবুওয়াত নেই'।[৫৪]

এ কবিতাগুলোও তার দিকে সম্বন্ধিত করা হয়—

'দীর্ঘ জীবনের পর আমার পিঠ কুঁজো হয়ে গেছে

---

[৫১] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*,১২/১৫০।
[৫২] *আল-কামিল*, ৬/৩৩৮।
[৫৩] প্রাগুক্ত।
[৫৪] *তারিখুল ইসলাম*, ৪৮১-৪৯০ হিজরির ঘটনাবলি এবং মৃত্যু সংক্রান্ত আলোচনা, পৃষ্ঠা : ১৪৭।

রাতগুলো আমাকে চরমভাবে নিষ্পেষিত করেছে,
এখন আমার জীবন কাটে, লাঠি আমার সম্মুখে হাঁটে
যেন কোনো বাঁকানো ধনুক তাকে স্থির করে রেখেছে'।

তিনি কবিতা শুনে খুবই প্রভাবিত হতেন। একবার তার অসুস্থ অবস্থায় আবু আলি আল-কোমসানি তাকে দেখতে এলেন। তিনি এসে শুনাতে লাগলেন—

'যখন আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন সকল ভালো কাজের নিয়ত করি
আর সুস্থ হয়ে গেলে আমাদের ঘটে বক্রতা এবং বিচ্যুতি,
প্রভুর কাছে কামনা করি, যখন আমরা ভীত হই এবং তাকে রাগিয়ে দিই
এবং যখন আমরা নিরাপদ থাকি,
তিনি যেন আমাদের কোনো আমল উৎসর্গ না করেন'।

উল্লিখিত কবিতা শুনে নিজামুল মুলক কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, তিনি যা বলেছেন তেমনই যেন হয়।[৫৫]

ইনতেকাল

৪৮৫ হিজরির রমজান মাসের ১০ তারিখ বৃহস্পতিবার। এ দিন ইফতারের সময় শেষে নিজামুল মুলক মাগরিবের নামাজ আদায় করে দস্তরখানের উপর বসে রয়েছেন। তার আশপাশে অনেক ফকিহ, কারি, সুফিগণ এবং মুখাপেক্ষী ব্যক্তিগণ ছিলেন। তিনি তাদের নাহাওয়ান্দের ঘটনা শুনাচ্ছিলেন এবং আমিরুল মুমিমিন উমর বিন খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে পারস্য ও মুসলিমদের মাঝে সংঘটিত হওয়া যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে শহিদদের বীরত্বের গল্প শুনাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, যারা তাদের সাথে মিলিত হয়েছে তাদের জন্য সুসংবাদ।

ইফতার শেষ করে তিনি বাসার দিকে পা বাড়ান। সেখানেই এক দাইলামি গোত্রীয় ব্যক্তি তার দিকে এগিয়ে আসে। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে কোনো আবেদন অথবা অভিযোগ জানাতে এসেছে। সে এসে সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে আঘাত করে হত্যা করে। তারপর তার দেহ বাড়ির প্রাঙ্গনে নিয়ে যাওয়া হয়।

বলা হয়, তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাকে বাতেনিয়্যাহরা হত্যা করেছে। সেনাবাহিনীর মাঝে এ খবর ছড়িয়ে পড়তেই হইচই শুরু হয়ে যায়। সুলতান মালিক শাহের কাছে এ সংবাদ

[৫৫] *তবাকাতুশ শাফিইয়্যাহ আল-কুবরা*, আল্লামা তাজুদ্দিন সুবকি, ৪/৩২৮।

পৌঁছলে তিনি এসে দুঃখপ্রকাশ করেন। সান্ত্বনা দেন এবং কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বেশকিছুক্ষণ নিজামুল মুলকের কাছে বসে থাকেন। নিজামুল মুলক মৃত্যু পর্যন্ত উদারতা অবলম্বন করেছেন। তিনি একজন সৌভাগ্যবানের জীবনযাপন করেছেন এবং স্মরণীয়, প্রশংসনীয় ও শহিদি মৃত্যুবরণ করেছেন।[৫৬]

তাকে হত্যাকারী পালাতে গিয়ে তাঁবুর রশিতে পা লেগে পড়ে যায়। নিজামুল মুলকের ক্রীতদাসরা তাকে ধরে ফেলে এবং সেখানেই হত্যা করে।

তার কোনো এক সেবক বলেন, নিজামুল মুলকের শেষকথা ছিল, 'আমার হন্তারককে তোমরা হত্যা করো না। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম'। এরপর তিনি কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান।[৫৭]

বাগদাদের অধিবাসীদের কাছে নিজামুল মুলকের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছলে তারা অত্যন্ত শোকাহত হয়। উজির এবং মন্ত্রীগণ তিন দিন শোক ঘোষণা করে কর্মবিরতি দেন। কবিরা মর্সিয়া রচনা করেন। তাদের মাঝে একজন ছিলেন মুকাতিল ইবনে আতিয়্যাহ। তিনি লেখেন—

'উজির নিজামুল মুলক ছিলেন দুর্লভ মুক্তা,
পরম দয়ালু তাকে গুরুত্বের সাথে তৈরি করেছেন,
সময় তার মূল্য দিতে পারেনি
তাই সময়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে তাকে উদ্দিশিত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে'।[৫৮]

ইবনে আকিল তার সম্পর্কে বলেন, নিজামুল মুলকের চরিত্রে ছিল দানশীলতা, উদারতা, ন্যায় এবং দীনি নিদর্শনাবলির পুনরুজ্জীবিত করার কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিপূর্ণ। তার সময় ছিল আহলে ইলমগণের প্রাচুর্যের সময়। তার সমাপ্তি হয় হত্যার মাধ্যমে। তখন তিনি রমজানে হজের উদ্দেশে সফর করছিলেন। তার মৃত্যুর মধ্যদিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের একজন বাদশাহের মৃত্যু হয়। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন।[৫৯]

---

[৫৬] *তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ আল-কুবরা*, ৪/৩২৩।
[৫৭] প্রাগুক্ত।
[৫৮] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১২/১৫১।
[৫৯] *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১৯/৯৬।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেলজুক সাম্রাজ্যের সমাপ্তি

সুলতান মালিক শাহ মৃত্যুর সময়ে চার পুত্র রেখে গিয়েছিলেন। বারকিয়ারক, মুহাম্মদ, সানজার এবং মাহমুদ। মাহমুদ পরবর্তী সময়ে নাসিরুদ্দিন মাহমুদ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তখনও শিশু ছিলেন। সে অবস্থায় সবাই তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে। কেননা মালিক শাহের সময়ে তার মা তুরকান খাতুন ছিলেন খুবই প্রভাবশালী। তার শাসনামল স্থায়ী ছিল দু বছর। ৪৮৫ হিজরি; ১০৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৪৮৭ হিজরি; ১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যেই মাহমুদ এবং তার মা ইনতেকাল করেন। তাদের পরে সিংহাসনে বসেন রুকনুদ্দিন আবুল মুজাফফর বারকিয়ারক বিন মালিক শাহ। ৪৯৮ হিজরি; ১১০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তার রাজত্ব স্থায়ী হয়েছিল। তার পরে ক্ষমতা লাভ করেন দ্বিতীয় রুকনুদ্দিন মালিক শাহ। সে বছরই গিয়াসুদ্দিন আবু সুজা মুহাম্মদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ৫২২ হিজরি; ১১২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তার ক্ষমতা স্থায়ী হয়েছিল। তিনি ছিলেন সেলজুক সাম্রাজ্যের শেষ শাসক। মা-ওরাউন্নাহারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাদের বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল এবং খোরাসান, ইরাক ও ইরানেও তাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। ৫২২ হিজরি; ১১২৮ খ্রিষ্টাব্দে এসে তাদের সাম্রাজ্য পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। খাওয়ারিজমের শাহেন শাহের হাতে এই ধ্বংসকল্প সম্পন্ন হয়েছিল।[১০]

মা-ওরাউন্নাহারের পাশঘেঁষা সেলজুকদের বিশাল সাম্রাজ্যের সমাপ্তির মধ্যদিয়ে সেলজুকদের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় এবং তাদের ঐক্যের সমাপ্তি ঘটে। শক্তিমত্তার দিক দিয়ে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। বিভিন্ন ছোট ছোট গোষ্ঠী, দল ও বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে সিংহাসন দখল নিয়ে পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে যায়। এর প্রেক্ষিতেই সুবিশাল সেলজুক সাম্রাজ্য কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এই ছোট ছোট রাজ্যগুলো কোনো একক সুলতানের নির্দেশ মেনে চলত না। যেমনটি তুঘরিল বেক, আলপ আরসালান,

[১০] *তারিখু দাওলাতি আলি সেলজুক*, মুহাম্মদ আল-ইস্পাহানি, পৃষ্ঠা : ৮১-১৫৪।

মালিক শাহ এবং তাদের পরবর্তীদের আমলে এক শাসকের হুকুম মেনে চলা হতো; বরং প্রত্যেক রাজত্বই পৃথক নেতৃত্বের মাধ্যমে স্বাধীন রাজ্য পরিচালনা করছিল। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য কোনো সম্প্রীতি পাওয়া যায় না।[৬১]

এর পরিণামেই মা-ওরাউন্নাহার অঞ্চলে খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারা দীর্ঘ দিন মঙ্গোলীয়দের আক্রমণের সামনে টিকে ছিল। এর সাথে সাথেই উত্তর ইরাক এবং শামে সেলজুকি রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যা আতাবিকিয়্যাহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এর মধ্যেই রোমের সেলজুক সাম্রাজ্যের আবির্ভাব ঘটে। এই সাম্রাজ্য ক্রুসেড আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং তাদেরকে এশিয়া মাইনরের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সীমাবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে মঙ্গোলীয়দের অব্যাহত আক্রমণ রোমের সেলজুক সালতানাতকে গুড়িয়ে দিয়েছিল।

সেলজুক সালতানাতের পতনের বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। তাদের পতন খিলাফতে আব্বাসিয়ার পতনেও অবদান রেখেছিল।

সেলজুক সাম্রাজ্য পতনের কারণসমূহ :

১- সেলজুকদের অভ্যন্তরীণ ভাই, চাচা, সন্তান এবং দৌহিত্রদের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ।

২- প্রশাসনিক বিষয়ে মহিলাদের অনুপ্রবেশ।

৩- আমির-উমারা, উজির এবং আতাবেকদের বিদ্বেষের মাধ্যমে ফিতনার আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া।

৪- আব্বাসীয় খলিফাগণের দুর্বলতা, যারা বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে সেলজুকদের সামনে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। সেলজুক সালতানাতের যারাই সিংহাসনে বসত তাদেরকে স্বীকার করে নিত এবং জুমআর খুতবায় তাদের নাম নেওয়া হতো।[৬২]

৫- আব্বাসীয় খিলাফতের পতাকাতলে ইরাক, মিসর ও শামকে একত্রিত করতে সেলজুক সাম্রাজ্যের ব্যর্থতা।

৬- সেলজুকদের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ বিভক্তি, যা তাদেরকে চলমান পারস্পরিক দ্বন্দ্বের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এর ফলে তাদের শক্তিমত্তা খর্ব হয়। একপর্যায়ে ইরাকে তাদের সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

৭- সেলজুক সাম্রাজ্যের প্রতি নিকৃষ্ট বাতেনিয়্যাহদের চক্রান্ত, তা বাস্তবায়নে তারা সেলজুক সুলতান, শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং সেনাপতিগণকে হত্যার জন্য অব্যাহত আক্রমণ পরিচালনা করেছে।

---

[৬১] *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ২৩।
[৬২] *আস-সালাতিনু ফিল মাশরিকিল আরাবি*, পৃষ্ঠা : ৫০।